ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 217-223
www.athenajournalcbm.in

কূটনৈতিকতত্ত্বরূপে মহাভারত ও শিশুপালবধে উপায়চতুষ্টয়: একটি সমীক্ষা

আকবর আলি*

প্রাপ্ত: ২৭.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ২৪.০৫.২০২৪ গৃহীত: ২২.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *প্রাচীনকালে মানুষ নিজ প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হতে থাকলে, তাদের মধ্যে গোষ্ঠী, দল, পরিবার, গ্রাম প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। তখন থেকে মানুষের মধ্যে দলপতি, রাজা, রাজ্য, রাষ্ট্র ও রাজনীতির চিন্তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য রূপে রামায়ণ ও মহাভারত সর্বজনবিদিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংসারিক, নান্দনিক, ধর্মীয় প্রভৃতি উপাদানগুলির পাশাপাশি রাজনৈতিক বিভিন্ন উপাদান এই মহাকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মহাভারতের কাহিনীর ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কুরু-পাণ্ডবদের সিংহাসন দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মহাভারতকে একটি রাজনৈতিক মহাকাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি 'ডিপ্লোমেসি' শব্দটির বাংলা অর্থ হলো কূটনীতি।[১] বিজিগীষু রাজার পররাষ্ট্রীয় নীতি বা শত্রুদের বশীভূত বা দমন করার জন্য যেসব উপায়সমূহ, তাদেরকে কূটনীতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র বিষয়ক বা রাজনৈতিক বিষয়ক চিন্তা ভাবনা ধর্মের মোড়কে আবৃত ছিল। মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, মহাভারতের শান্তিপর্ব, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে রাষ্ট্র বা রাজনীতি বিষয়ক উপাদানগুলি কাব্যিক ছন্দে রসোপলব্ধি ঘটানোর মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়ায় শিশুপালবধ মহাকাব্যটি সহৃদয় থেকে কুটিলমতি সকলের অত্যুপাদেয় হয়ে উঠেছে। শিশুপালবধে রাজনৈতিক উপাদান রূপে উপায়চতুষ্টয় (সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড) কাব্যের ছলে বা কাহিনির মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ায় সরলমতি ব্যক্তিরাও অল্প আয়াসে কূটনীতির তত্ত্বগুলি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। আলোচ্য সন্দর্ভপত্রটিতে কূটনৈতিকতত্ত্বরূপে মহাভারতের সভাপর্ব ও শিশুপালবধে উপায়চতুষ্টয়ের এক তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *মহাভারত, শিশুপালবধ, উপায়চতুষ্টয়, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, কূটনীতি।*

---

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: akbarali.jusans@gmail.com

ভূমিকা

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার সবকিছুই নিয়ম-নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নী- ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় যোগে নীতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যা কোন কিছুকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে, তাই হলো নীতি— 'নয়নাৎ নীতিরুচ্যতে'। অর্থাৎ নীতি হলো নিয়ম, বিধান, অনুশাসন, মতাদর্শ যা সাধারণ মানুষকে অনুচিত পথ থেকে উচিৎ, অসৎ থেকে সৎ, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।[২] বেদ-উপনিষদের পর থেকে রামায়ণ এবং মহাভারত তথা মহাকবিদের কাব্যে এই নীতি (তা সুনীতি হোক বা রাজনীতি) চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির অমূল্য উপদেশ রূপে বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে দান করে আসছে। পৃথিবীর ধ্রুপদী মহাকাব্য চতুষ্টয়ের অন্যতম হলো মহাভারত, যা ভারতীয় আবহমান ঐতিহ্যের এক আকরগ্রন্থ এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের অমূল্য সম্ভার।[৩] সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময় মহাকবি মাঘ মহাভারতের সভাপর্বের বিষয় অবলম্বনে শিশুপালবধ রচনা করেন। গ্রন্থে সহৃদয়ের রসোপলব্ধির বিষয়কে সবিশেষ গুরুত্ব দিলেও রাজনৈতিক দিকগুলি উপেক্ষিত হয়নি। রাজ্য বা রাষ্ট্রের সুপরিচালন ব্যবস্থায় কূটনৈতিকতত্ত্ব রূপে উপায়চতুষ্টয়ের জুরি মেলা ভার। কবি মাঘ মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয়নীতিসার, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করে শিশুপালবধে রাজনীতির কূটনীতিতত্ত্ব পরিবেশন করছেন। তাই শিশুপালবধ বিশ্লেষণী আতশ কাচে একটি রাজনৈতিক মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

কূটনৈতিকতত্ত্বরূপে উপায়চতুষ্টয়ের বিবরণ

শত্রুদের বশীভূত বা দমন করার জন্য যেসব উপায়সমূহ অথবা বিজিগীষু রাজার ষাড্গুণ্যাদি যে পররাষ্ট্রীয় নীতি তাদেরকে কূটনীতি বলা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধিকরণে কিংবা মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে সামাদি উপায় বা ষাড্গুণ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। নীতিশাস্ত্রকারেরা মূলত চারটি উপায়কে কূটনীতির চাবিকাঠি বলে মনে করেন। এই চারটি উপায় হলো সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড।[৪] ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রে রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে এইসব উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপায় প্রয়োগে রাজাকে সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও উপায়রূপে সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডকে স্বীকার করা হয়েছে। এই উপায়গুলির দ্বারা শত্রুদের নিজের বশে আনতে রাজা সক্ষম হন বলে টীকাতে বলা হয়েছে।[৫] শুক্রনীতিসার গ্রন্থে শত্রু ও মিত্রকে বশীভূত করার জন্য সামাদি উপায় ব্যবহার করে কাউকে ভেদ, কাউকে বা পীড়ন করার কথা বলা হয়েছে। কামন্দক তাঁর নীতিসার গ্রন্থে মহাবুদ্ধিমান রাজাকে সহায় সম্পন্ন হয়ে শত্রুর প্রতি উপায় প্রয়োগ করতে বলেছেন।[৬] কামন্দক তাঁর নীতিসার গ্রন্থে উপরোক্ত চারটি উপায় ছাড়াও মায়া, উপেক্ষা, ইন্দ্রজাল এই তিনটি অতিরিক্ত উপায় স্বীকার করেছেন। মহাভারত ও শিশুপালবধে যত্র তত্র এই উপায়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়। উভয় মহাকাব্যে কাব্যের মোড়কে কিভাবে সামাদি উপায় চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হবে নিম্নালোচনার মাধ্যমে।

১. সাম

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড— এই উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে সামের দ্বারা স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয় বলে সামকে সকলের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সামের অর্থ হলো মধুর ভাষণ। সাধারণ প্রজা অথবা বিরুদ্ধ রাজার উদ্বেগ সৃষ্টি না করে গুণকীর্তন বা গুণ না থাকলেও গুণের উদ্ভাবন করে প্রশংসা বা স্তুতিপূর্বক সাম ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও শত্রু রাজা বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞাতিসম্বন্ধ, বৈবাহিকসম্বন্ধ, কুল-হৃদয়সম্বন্ধ, আয়তিপ্রদর্শন, আত্মোপনিধান প্রভৃতি নানা রকম ভাবে সাম স্থাপনের উপদেশ অর্থশাস্ত্রে আছে।

বৈয়াসিক মহাভারতের সভাপর্বে নারদ মুনি যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে রাজধর্ম সম্পর্কে নানা রকম জ্ঞান দিয়ে তাঁকে ব্যুৎপন্ন করেছিলেন। মাঘের শিশুপালবধ কাব্যে অন্য চিত্র দেখা যায়। সেখানে নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন। উদ্দেশ্য

একটাই- শিশুপালের নিধন। কারণ শিশুপাল আপন তেজে সমস্ত দেবতা, দৈত্য ও রাক্ষসের অনুগ্রহ করে থাকেন। বোঝাই যাচ্ছে যে শিশুপালের ক্ষমতা ও শক্তির কাছে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নমিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। সুতরাং শিশুপালের বধ জরুরি ছিল। কিন্তু কাজের পূর্ণতা দেবে কে? এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে পারেন একমাত্র বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অবতার পুরুষ। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ক্রোধ আগে থেকেই ছিল। তাই শত্রুর (শিশুপালের) শত্রু (শ্রীকৃষ্ণ) আমার মিত্র—এই প্রবাদের মতো ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত নারদ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি পাঠ, প্রশংসা ও মিষ্টভাষণরূপ সামবচনের প্রয়োগ করেছেন।[৭] শুধু তাই নয়, নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব অবতারের প্রসংশা করে তাঁকে এই কার্যে প্ররোচনা দিয়ে সামনীতির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেয়েছেন। এই জন্মে তিনি মদগর্বিত কংসাদির অত্যাচার থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। শিশুপাল মদগর্বিত, অত্যাচারীও বটে। সুতরাং তাঁকেও শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করে পৃথিবীকে দুষ্কৃতি মুক্ত করবেন এটা বলার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকর্মের প্রশংসারূপ সামবচন নিবেদিত হয়েছে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণও নারদের প্রশংসা করে তাঁর কৃপা প্রার্থী হয়েছেন। তিনি প্রশংসা করে বলেন- মহাজনেরা পূজার দ্বারা পূজ্যদের বশীভূত করতে আগ্রহী হন।[৮] বস্তুত, এই প্রশংসার দ্বারা পারস্পরিক গুণসংকীর্তন করে একজন আর একজনকে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এখানে সামনীতির দ্বারা শত্রুদমনের প্রতি উৎসাহ বর্ধনের নীতি প্রযুক্ত হয়েছে। বৈয়াসিক মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের মন্ত্রণা হয়। সেখানে জরাসন্ধকে হত্যার আগে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসারূপ সামবচন প্রয়োগ করেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা বীরযোদ্ধা হলেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁদের কার্যসিদ্ধি অসম্ভব ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করে নিজের পক্ষে রাখাও যুধিষ্ঠিরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শিশুপালবধে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণের যে মন্ত্রণা হয়, তাতে সামনীতির যৎসামান্য নিদর্শন মেলে। উদ্ধবের কথা মতো শ্রীকৃষ্ণকে শিশুপালের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ করতে বলে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাম উপায় অবলম্বন করতে বলেন। উদ্ধব বলেন—আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) কাঁধের ওপর গুরু দায়িত্ব দিয়ে বন্ধু যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সম্পাদন করতে চান। এই বন্ধু সম্বোধনের উদ্দেশ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নির্বিঘ্নে কার্যসিদ্ধি করা। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যতটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তার তুলনায় বহু গুণে মিত্রতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই মিত্রতা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার জন্য উভয়ই উভয়কে সাম প্রয়োগ করে বশীভূত করতে চাইতেন। শিশুপালবধের চতুর্দশ অধ্যায়ে মিত্র কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দানের আগে নিজেদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির বলেছেন—'তুমি ধর্মময় বৃক্ষের মূলকাণ্ড হওয়াই আমি ধর্মময়বৃক্ষ হয়েছি'।[৯]

এই মহাকাব্যে শিশুপালকে হত্যা করাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সামবাক্য নির্গত হতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—তোমার কার্য সম্পাদনে আমি দৃঢ়ব্রত। তুমি আমাকে এ ব্যক্তি ধনঞ্জয় থেকে ভিন্ন-এ রকম মনে করবে না। তাছাড়া যজ্ঞসভায় উপস্থিত শিশুপালের ক্রোধ সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে ভেদনীতি সৃষ্টির প্রথম ধাপ হিসেবে সামের প্রশংসা শোনা যায়। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের জন্য এই সাম প্রয়োগ সর্বত্র দেখা যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সুস্থভাবে পরিচালনা এবং পরবর্তী সময়ে বিপদে আপদে কৃষ্ণের সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভের জন্য সামনীতির প্রয়োজন ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থে আসার সময় যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত কৃষ্ণকে সাদরে গ্রহণ করতে যাওয়া এবং নিজের হাতে রথের লাগাম তুলে নেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুত এক রাজার সঙ্গে অন্য রাজার, একদেশের সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সামনীতির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। যে দেশের মিত্রশক্তি যত বেশি, সেই দেশ তত বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন।

২. দান

পররাষ্ট্রের সাথে প্রীতি উৎপাদনের জন্য অর্থ বা অন্যান্য বিশেষ উপহার দেওয়াকে দান বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মিতাক্ষরা টীকাতে সুবর্ণ প্রভৃতি নানা দ্রব্য বিপক্ষীয়দের প্রদান করাকে দান বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে দানকে প্রায় সব পণ্ডিতেরা মান্যতা দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিজিগীষুকে তাঁর অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী রাজাকে

সাম প্রয়োগের দ্বারা নিজের আয়ত্বে না আনতে পারলে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে বশীভূত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থ বলতে এখানে ভূমি-হিরণ্য (সোনা) প্রভৃতি দানের কথা বলা হয়েছে। শত্রুর ক্ষমতা বিচার করে পরিমিত রাজস্ব বা দানের দ্বারা সারা বছর সন্তুষ্টিবিধানের কথা শুক্রনীতিতেও আছে। দানশীল রাজা খুব কম সময়ের মধ্যে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের জয় করতে সমর্থ হন দানের সঠিক প্রয়োগের দ্বারা।

বৈয়াসিক মহাভারতের সভাপর্বের কিছু খণ্ড খণ্ড ঘটনায় দানের প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করবেন। কিন্তু তার আগে জরাসন্ধ বধ হওয়া দরকার। কারণ জরাসন্ধ বেঁচে থাকলে এই যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠিরের কোনো লাভ হবে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির কপটযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করে বন্দি রাজাদের মুক্ত করলে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্যের নিমিত্ত সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।[১০] কী সেই সাহায্য? আর্থিক সাহায্য দানের প্রসঙ্গ এখানে বিদ্যমান। কারণ রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যদিকে জরাসন্ধের মৃত্যুতে মগধের রাজসিংহাসনে তাঁর পুত্র সহদেবকে বসানো হলে তিনিও অনেক মহার্ঘ্য দানের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দিকে রাজকোশের সমৃদ্ধির জন্য চার পাণ্ডব দিগ্বিজয়ে চতুর্দিকে যাত্রা করেন। ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব বিভিন্ন রাজাদের সাথে যুদ্ধ করে দানগ্রহণের মাধ্যমে প্রচুর কর লাভ করেন। শিশুপালবধে দান রূপে দু'বার অর্ঘ্যদানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যদিও রাজনীতিশাস্ত্রের মতো একে দাননীতি রূপে সেভাবে উল্লেখ করা না হলেও শিশুপালবধে কূটনৈতিক চালে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ত্রিকালজ্ঞ, চতুর নারদ মুনিকে কৃষ্ণ অর্ঘ্য প্রদান করে মঙ্গলাচারধর্ম রক্ষা করার সাথে সাথে পরোক্ষ ভাবে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর কৃপা লাভে প্রয়াসী হয়েছেন। যজ্ঞকালে ইন্দ্রপ্রস্থে অনেক স্বাধীন ও বিজিত রাজাদের সঙ্গে পারস্পরিক অনেক মহার্ঘ্য দ্রব্য ভেট রূপে আদান-প্রদান করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যজ্ঞের পরিসমাপ্তিতে নীতিশাস্ত্রের চিরাচরিত দান থেকে স্বতন্ত্র এবং মহার্ঘ্য দান করেছিলেন অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে। এই দান শিশুপালবধে মহাকাব্যিক ক্লাইম্যাক্স তৈরি করেছে। কারণ এর পরই শিশুপাল ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রমুখের প্রতি নিন্দার ঝড় তোলেন। ক্রোধবশত শিশুপাল তার একশো অপরাধের সীমা লঙ্ঘন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পরবর্তী দণ্ডনীতি অবলম্বন করে শিশুপালকে বধ করেন। অতএব এই কাব্যে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান না করলে শিশুপালবধের ঘটনা প্রবাহ অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। আধুনিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সত্ত্বায় দান খুব প্রশংসনীয়। যুগের সাথে সাথে দানের অর্থ পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু উদ্দেশ্য (অন্যকে বশীভূত করা) আজও এক আছে। বিপদে আপদে বিপক্ষের দেশগুলিকে নানা ভাবে কিছু না কিছু সাহায্য করে ভবিষ্যতে নানা স্বার্থ চরিতার্থ করেন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানেরা। বিশ্বরাজনীতির দিকে চোখ রাখলে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মেলে।

৩. ভেদ

শত্রুপক্ষের একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতাকে নির্মূল করা ভেদের একমাত্র কাজ। মনুসংহিতাতে শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বশীভূত করাকে ভেদ বলা হয়েছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ভেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— শত্রু মনে আশঙ্কা ও ভয় সৃষ্টি করে বিভেদ করাকে ভেদ বলে।[১১] শত্রুপক্ষীয় মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিত, এমনকি যুবরাজ প্রবল হলেও এদের একজনকে ভেদ করতে পারলেই রাজাকে নিজের বশে আনা সহজ হয়। সঙ্ঘবদ্ধ শত্রুদের নিজের বশে আনতে ভেদ ছাড়া আর কোন গতি নেই। শত্রুরাষ্ট্রে একতা ভাঙার জন্য বসবাসকারী সাধারণ প্রজাদের মধ্যে পারস্পারিক স্নেহ, ভালোবাসা নষ্ট করতে হবে। এই প্রীতি, ভালোবাসা বিনষ্ট হলে নিজেদের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হয়ে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হবে। বিপক্ষীয় রাজা এই সব সমস্যার সম্মুখীন হলে বাহ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ভিদ্য হবেন।

শিশুপালবধে দ্বিতীয় সর্গে উদ্ধবের মন্ত্রণায় ভেদনীতি প্রকটিত হয়েছে। আপন ক্ষমতায় বলীয়ান চেদিরাজ শিশুপালের প্রতি দেবতারাও অতিষ্ঠ ছিলেন। তার বিরুদ্ধে দণ্ড প্রয়োগ করা এই মুহূর্তে হটকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং শিশুপালের ভৃত্য ও অমাত্যদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করার কথা বলেছেন।[১২] এই ভেদ শিশুপালকে দুর্বল করে তুলবে যার ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অতি সহজেই শিশুপালকে নিজের বশে আনতে সমর্থ হবেন। উদ্ধব জানতেন অনেক

দেশ-দেশান্তরের রাজাদের সঙ্গে শিশুপালও আসবেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে। কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রীতি, বন্ধুত্ব ও মিত্রতাবশত কৃষ্ণের প্রতি বেশি ভক্তি দেখালে পরশ্রীকাতর রাজারা নিজেরাই বিরুদ্ধে গিয়ে বিরোধিতা করবেন। শিশুপালের মিত্র রাজারা নিজের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে কোকিল যেমন কাক থেকে আলাদা হয়ে যায়, তেমনই মিত্র রাজারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে।[১৩] তখন কৃষ্ণ সহজেই শিশুপালকে পরাজিত করতে সমর্থ হবেন। ষোড়শ সর্গে শিশুপালের পাঠানো দূতের বার্তা বিশ্লেষণ করলে ভেদের উদাহরণ পাওয়া। কৃষ্ণের সাথে যে সব রাজারা মিত্র ভাবে অবস্থান করছেন, তারাও অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হবেন বলে দূত মন্তব্য করেন। দূত আরো বলেন যে, কৃষ্ণ বড়ো বড়ো রাজাদের শত্রু করে রেখেছেন। শিশুপাল একজন বড়ো মাপের রাজা। তাই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পাশাপাশি মিত্র রাজাদেরও ধ্বংস করে আনন্দ লাভ করবেন। সুতরাং স্নায়ুযুদ্ধে শিশুপালকে এগিয়ে রেখে এই রকম ভেদ মূলক কথা বলে প্রকারান্তরে শিশুপাল শত্রুপক্ষের রাজাদের ভেদ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বৈয়াসিক মহাভারতের সভাপর্বে যজ্ঞের আগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে ভেদ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। জরাসন্ধ প্রাণে বেঁচে থাকলে যুধিষ্ঠির কোনো দিনও সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হতে পারবেন না।[১৪] অতএব জরাসন্ধকে হত্যা করলে যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হওয়ার পথ যেমন সুগম হবে, তেমনই ক্ষমতাশালী শিশুপালের ক্ষমতা কমে যাবে এবং সহজে তাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। রাজসূয়যজ্ঞে ভেদমূলক বাক্য বলে শিশুপাল কৃষ্ণের মিত্ররাজাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। অধুনা বিশ্ব রাজনীতিতে ভেদের উপস্থাপন খুব সন্তর্পনে করা হয়। নানা গুপ্তচর নিয়োগ করে পররাষ্ট্র ভেদ করে নিজের বশে আনা বর্তমান আগ্রাসী দেশ গুলির মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. দণ্ড

সাম, দান এবং ভেদ এই তিনটি পদ্ধতি কোন কারণে ব্যর্থ হলে দণ্ড প্রয়োগ করে শত্রুকে সরাসরি বশে আনার কথা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন। রাষ্ট্র ও প্রজাদের রক্ষা করার জন্য জগতে যে নিয়ম, ব্যবস্থা প্রচলিত তাকে দণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। এই দণ্ড কেবলমাত্র দুষ্কৃতকারীকে দমন করে না, যেকোন সাধারণ ব্যক্তিকেও দণ্ড সংযত করে। বিজিগীষু রাজা আপন রাজ্যে এবং পররাজ্যে কার্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে দণ্ড প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে রাজা যখন নিজ রাজ্যে অতুষ্ট ভাবাপন্ন সাধারণ প্রজাদের সাম, দান এবং ভেদ দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারবেন না, তখন তিনি দণ্ড প্রয়োগ করে সবাইকে নিজের বশে আনার চেষ্টা করবেন। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে সাম, দান এবং ভেদ এই তিনটি উপায় যদি নিষ্ফল হয়, তবে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি ধীরে ধীরে দণ্ড প্রয়োগ করে বশীভূত করতে হবে।

ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধের ওপর দণ্ডনীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নানান যুক্তির অবতাড়না করে পরিশেষে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং দণ্ডনীতি প্রয়োগের কথা বলেন।[১৫] কৃষ্ণ হংস, ডিম্বক এবং কংসের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করে তাঁদের বধ করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বেড়িয়ে নানা দিকের রাজাদের দণ্ড প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকারে নিয়ে এসেছিলেন। দণ্ডনীতি প্রয়োগ করে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে যুদ্ধের রূপরেখা দেখা যায় না। সুতরাং লড়াই ছিল নাম মাত্র। শিশুপালবধ মহাকাব্যের শুরুতেই ইন্দ্র নারদের মারফত কৃষ্ণের উপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। দায়িত্বটা হলো শিশুপালের ওপর দণ্ড প্রয়োগ। শিষ্টের পালক ও দুষ্টের দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ বিধাতার অনুশাসন লঙ্ঘনকারী শিশুপালের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরামও মন্ত্রণা কালে শিশুপালের ওপর দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও দণ্ডের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধচারীকে সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিরোচ্ছেদের কথা কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়। যজ্ঞকালে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক বাক্য বলে একশো অপরাধ অতিক্রম করলে শ্রীকৃষ্ণ রুদ্ধমূর্তিতে দণ্ড ধারণ করে শিশুপালকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করেন।[১৬]

এইভাবে চারপ্রকার উপায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে যথাযথ দণ্ড প্রয়োগ করে নিজের তথা ইন্দ্রের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন এবং জগৎকে দুষ্কৃতি মুক্ত করে জগতের পাপভার লাঘব করেছিলেন।

উপসংহার

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, রাজনীতির বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার প্রয়োজন ছিল। রাজনীতি ছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তথা পরিণতবুদ্ধির দক্ষ কূটকৌশল প্রয়োগের বিভিন্ন দিকনির্দেশ। সেখানে শুধু গায়ের জোর, শক্তিসামর্থ্য, ব্যূহ রচনার মাধ্যমে যুদ্ধে জয় হত না। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য বুদ্ধির জোরের আবশ্যকতা ছিল, প্রয়োজন ছিল কূটনৈতিক দক্ষতার। একজন রাজাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে খুব সন্তর্পনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হত। বস্তুত, ন্যায়সঙ্গত, সুষ্ঠসমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা ছিল রাজনীতিশাস্ত্র সমূহের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে গা-জোয়ারিনীতি, নেতাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অন্যায়-অবিচার, লোলুপতা অধুনা রাজনীতির ভাবনাকে যেন বাহুলাংশে কলুষিত করে তুলেছে। বর্তমান এই সংকটাবস্থা কাটাতে আমাদের অতীত শাস্ত্রাধ্যয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। অতীতের এই সমস্ত রাজশাস্ত্র বা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমাজ তথা ভবিষ্যত প্রজন্ম চলার পথে একটা নতুন দিশা খুঁজে পাবে। বিজিগীষু রাজারা প্রয়োজনের সাপেক্ষে পররাষ্ট্রীয় রাজাদের সঙ্গে সাম, দানাদি নানা উপায় অবলম্বন করতেন। এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে দেশের স্বার্থে সেই উপায়চতুষ্টয়ের উপযোগিতা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় নি। সেক্ষেত্রে শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতিতুলনার মাধ্যমে রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে কিছু পারিভাষিক শব্দ যেমন চুক্তি, আইন, কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি আধুনিক বলে মনে হলেও প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্র তথা মাঘের শিশুপালবধে এদের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে শিশুপালের নিধন সম্পন্ন হবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা। এই নিধন যজ্ঞের অগ্নিতে ঘি ঢেলেছে নারদ মুনির প্ররোচনা। 'অশুভ আচরণে যাদের বিপদ পূর্ণতা পেয়েছে সেসব অসজ্জনকে সজ্জনদের ধ্বংস করা উচিৎ'- তাঁর এই কূটনৈতিক বক্তব্য শিশুপালবধকে তরান্বিত করেছিল। অপরাধীর শাস্তি বিধান দেশের সাংবিধানিক নিয়ম। শিশুপাল অত্যাচারী সুতরাং অপরাধী। তাঁর কৃতকর্মের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বলরাম অপরাধী শত্রুদের সমূলে উৎপাটনের কথা বললেও কূটনীতিকে আশ্রয় করে উদ্ধবের কথামতো শ্রীকৃষ্ণ 'কোকিলরা যেমন কাক থেকে পৃথক হয়ে যায় তেমনই শিশুপালপক্ষীয় রাজারা পৃথক হয়ে যাবেন'— এই ভেদনীতি অবলম্বন করে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বা পররাষ্ট্রনীতি কিংবা আন্তঃরাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির পরস্পরের হাত মিলিয়েছেন। রাজসূয়যজ্ঞের সুষ্ঠ সম্পাদনা এবং ভেদনীতির প্রয়োগ করে শিশুপালের বিরুদ্ধে বিগ্রহ— এই উভয় কার্যের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা কাম্য ছিল। শুধু যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য থাকলে বিশাল সেনাবাহিনী সহ অভিযান করতেন না। চুক্তি অনুসারে যজ্ঞের সময় বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিদের আগমন এবং সমর্থন ঋণাত্মক পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টান্ত। রণক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণও আন্তঃরাজ্যের সুসম্পর্ক তুলে ধরে। রাষ্ট্র বা বিদেশনীতিতে কূটনীতির চমৎকার প্রয়োগ সহায়ক হলে সকলের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনকালে শাসকের (তা দলপতি থেকে রাজা বা রাষ্ট্রপতি) রাজ্য পরিচালনা, যুদ্ধ বা কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের নীতির বিবর্তিতরূপ শিশুপালবধে দেখা যায়। নিজ বুদ্ধিবলে সাম, দান প্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ের কূটনৈতিক প্রয়োগ শিশুপালবধে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কূটনৈতিকতত্ত্বের অনুসন্ধানে উপায়চতুষ্টয়ের মতো কূটনৈতিক উপাদান বিশদে দেখা যায়। কূটনৈতিক জয়-পরাজয়ের উপর রাষ্ট্রস্বার্থের জয় এবং পরাজয় নির্ভর করে। সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড— এই চারটি নীতি যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করে শিশুপালবধে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হয়েছে। কূটনৈতিক দ্বন্দ্বই বর্তমানে যুদ্ধের পরিমার্জিত ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে দাড়িয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবল যতই থাকুক না কেন, কূটনীতি সুপ্রযুক্ত না হলে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চরম ব্যাঘাত ঘটে। একবিংশতি শতকে দাঁড়িয়ে উপায়চতুষ্টয় চরম কূটনীতির পরিচায়ক। "আমি তোমার সাথে সর্বাদা আছি"— এই রকম বাক্য বলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে, এক দেশকে মৌখিক সমর্থন এবং আরেক দেশকে অস্ত্রবল দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তৎপর রাষ্ট্রপ্রধানেরা।

সূত্র নির্দেশ:

১. https://www.britannica.com/topic/diplomacy, accessed 16th February, 2024.

২. মণ্ডল, দেবদাস, (২০১৯), *ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ৭২।

৩. 'অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনমিতবুদ্ধিনা॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), (সম্পা.), *মহাভারত (আদিপর্ব্ব)*, বিশ্ববাণী প্রকাশণী, পৃ. ১৮৭।

৪. 'Negotiation, bribery, causing dissension, and open attack are forms of stratagem (Upāya)'—Shamasastry, R., (1951). (Trans.). *Kautilya's Arthasastra*, Mysore Press, p. 74.

৫. 'এতে সামাদয়ঃ পরিপন্থ্যাদি সাধনোপায়ঃ।'—পাণ্ডে, উমেশচন্দ্র, (১৯৯৪), (সম্পা. ও অনু.), *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, পৃ. ১৫৩।

৬. 'মহাপ্রাজ্ঞানসম্পন্নঃ সহায়ৈরূপবৃংহিতঃ।
উদ্যোগাধ্যবসায়াভ্যামুপায়ান্নিক্ষিপেৎ পরে॥'—Sāstrī, T. Gaṇapati, (1921). (Ed.). The Nītisāra of Kāmadaka, Travancore Government Press. p. 257.

৭. 'অনন্যগূর্বাস্তব কেন কেবলঃ পুরাণমূর্ত্তের্মহিমাঽবগম্যতে।
মনুষ্যজন্মাঽপি সুরাসুরান্ গুণৈর্ভবান্ ভবচ্ছেদকরৈঃ করোত্যধঃ॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (২০১৫), (সম্পা. ও অনু.), *শিশুপালবধ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ২১।

৮. 'বিধায় তস্যাপচিতিং প্রসেদুষঃ প্রকামমপ্রীয়ত যজ্বনাং প্রিয়ঃ।
গ্রহীতুমার্যান্ পরিচর্যয়া মুহুর্মহানুভাবা হি নিতান্তমর্থিনঃ॥'—ভট্টাচার্য্য, জীবানন্দবিদ্যাসাগর, (১৯২০), (সম্পা.), *শিশুপালবধম্*, সিদ্ধেশর প্রেস, পৃ. ২৪।

৯. 'সপ্ততন্তুমধিগন্তুমিচ্ছতঃ কুর্বনুগ্রহমনুজ্ঞয়া মম।
মূলতামুপগতে প্রভো! ত্বয়ি প্রাপি ধর্মময়বৃক্ষতা ময়া॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (২০১৫), (সম্পা. ও অনু.), *শিশুপালবধ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ৫৪৯।

১০. 'তস্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য পার্থিবর্ত্বং চিকীর্ষতঃ।
সর্বৈর্ভবদ্ভির্বিজ্ঞায় সাহায্যং ক্রিয়তামিতি॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), (সম্পা.), *মহাভারত (সভাপর্ব্ব)*, বিশ্ববাণী প্রকাশণী, পৃ. ২২৮।

১১. 'শঙ্কা জননং নির্ভৎর্সনং চ ভেদঃ।'—বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, (২০১০), (সম্পা.), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ২৬৯।

১২. 'অজ্ঞাতদোষৈর্দোষোজ্ঞৈরুদ্দূষ্যোভয়বেতনৈঃ।
ভেদ্যাঃ শত্রোরভিব্যক্তশাসনৈঃ সমবায়িকাঃ॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (২০১৫), (সম্পা. ও অনু.), *শিশুপালবধ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ১০০।

১৩. 'বলিপুষ্টকুলাদিবান্যপুষ্টৈঃ পৃথগস্মাদচিরেণ ভাবিতা তৈঃ।'— *তদেব*, পৃ. ১০২।

১৪. 'ন তু শক্যং জরাসন্ধে জীবমানে মহাবলে।
রাজসূয়ং ত্বয়াবাপ্তুমেষা রাজন্! মতির্মম॥'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), (সম্পা.), *মহাভারত(সভাপর্ব্ব)*, বিশ্ববাণী প্রকাশণী, পৃ. ১৪৮।

১৫. 'ক্ষিপ্রমেব যথা ত্বেতৎ কার্য্যং সমুপপদ্যতে।
অপ্রমত্তো জগন্নাথ! তথা কুরু নরোত্তম!'— *তদেব*, পৃ. ১৮৫।

১৬. 'তেনাহহক্রোশত এব তস্য মুরজিত্তৎকাললোলানল-
জ্বালাপল্লবিতেন মূর্দ্ধবিকলং চক্রেণ চক্রে বপুঃ।'—ভট্টাচার্য্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (২০১৫), (সম্পা. ও অনু.), *শিশুপালবধ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ৮৬৯।